সম্পাদকের কলমে

সেই সাত পাহাড় পথ!

ব্রহ্মলোকের ফুল (ব্রহ্মকমল) দিয়ে যদি মর্ত্যের দেবালয় সাজাতে হয় যেতে হবে সেই সাত-পাহাড় পথ। তেমন করে ভালোবাসার কথা লিখতে গেলে চাই রেশমি ভুজপাতা (আসলে ভুজবৃক্ষের ছাল), সেও সেই সাত-পাহাড় দূরের বনমহল। কবির মতো বিশ্বসংসার তন্ন তন্ন করে যদি খুঁজে আনতে হয় ঝিনুকে মুক্তোর ফসিল, পৌঁছে যেতে হবে শতদ্রু, গণ্ডকী, কিম্বা সিন্ধু নদের উৎসে। গেলেই কি যাওয়া যায়? সাহস লাগে, বিস্তর ঝুঁকি নিতে হয়, টাকার থলিটাও হতে হয় ভারি। আগেকার দিনে এটুকুই সম্বল ছিল। দুম করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তাম; একপাহাড় দুপাহাড় করে যেই বিশাল এক পাথরের পাচিল বা চট্টানের সামনে গিয়ে থমকেছি, নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা, বুকে ভয়ংকর ধুকপুক! হঠাৎ ছুটে আসা নদী বা ঝাঁপিয়ে নামা ঝরনার সামনে পড়লে জীবনবাজি রাখার চ্যালেঞ্জ। তখন কোন ফরিশ্‌তা এসে দড়ি দিয়ে বেহশ্‌তের সাঁকো বানিয়ে দেবে? কে-ই বা হাতের রশি ঝুলিয়ে গিরিশিরার মাথায় টেনে তুলবে? আগে তো রাতেও হাঁটতে হতো, ভুল রাস্তায় হারিয়ে এজনমে ঘরে ফেরার আশা ছেড়ে দিতাম। কী করার ছিল? আকাশের তারা চিনতাম না, দিক ভুল হয়ে যেত যখন তখন। এখনকার মতো খোলা আকাশের নিচে পাহাড় চড়ার পাঠশালা সাজিয়ে কে আর বসত? হয়তো ছিল, হাত ধরে সেখানে নিয়ে যাবার কেউ ছিল না। ফলত আমাদের স্বপ্ন ছিল গোটা বিশ্ব ছুঁয়ে দেখার, কিন্তু একপাহাড়ের গলি ঘুঁজি সামাল দেওয়ার কলাকৌশলটুকুও জানা ছিল না। তবু, ওই কিছুটা বরাত-ভরসা করে, কিছুটা যেতে যেতে পোক্ত হয়ে, সাত-পাহাড় পথ পেরিয়ে যাবার সাহস করেছি। এবং এখনও পর্যন্ত বেঁচে বর্তে আছি! আর এখন?

দিন কাল বদলেছে। এখন পাহাড়ে চড়ার হাতে (পায়েও) খড়ি দেওয়া হয়। ফি বছর পাহাড় চড়ার পাঠশালা বসে খোলা আকাশের নিচে – শুশুনিয়া, ঝালদা, জয়চণ্ডী, মাঠা বা গজাবুরু পাহাড়কোলে। এটা এক মহতী আয়োজন যা অভিযাত্রী দলগুলো তাদের বছরকার বড় পার্বনের মতো করে থাকে প্রতি শীতের মরশুমে। সে বিশাল সমাগম। এরকম এক একটা শিবিরে হাজিরা দিলেই মনে হয়, দেবলোকের পুত্রকন্যারা মাটির পৃথিবীতে এসেছে বিশ্বরূপ দর্শনের বিধিবিধান ইত্যাদি শিখে নিতে। যে দুনিয়াটা একদিন ওরা চিনবে হাতের তালুর মতো করে, তার শুরুয়াত না হয় এখান থেকেই হোক। একদিন তো ওদের হাতেই যাবে এই ভুবনের ভার। এর যা কিছু রোগ জরা আজও রয়ে গেল বাসা বেঁধে, সেদিন এই

ভুবনের ভার। এর যা কিছু রোগ জরা আজও রয়ে গেল বাসা বেঁধে, সেদিন এই হাতগুলো তার শিকড় বাকড় উপড়ে ফেলবে, এই ভরসাটুকু অন্তত জাগে এখানে এলে। খুব সরল করে যদি বলি, আগামীর অভিযাত্রীদের শাস্ত্রমতে দীক্ষা কাণ্ড চলে এইসব ক্যাম্পকোর্স-এ, চারদিনের খোলা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনেক সংস্থা ধারাবাহিকভাবে বছরকার এই উদ্যোগটি নিয়ে থাকে, আমাদের আরোহী-ও নেয়। ব্যতিক্রম এইটুকু, আরোহী এক্ষেত্রে অকপটভাবে রিলিজিয়াস। এর মানে এই নয় যে, আমরা ছেলেমেয়েদের ধরে বেঁধে ধম্মকম্ম শেখাই। একেবারেই না। ওই যে ছেলেমেয়েরা ভোরের আধো আঁধারে দল বেঁধে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে পতাকার নিচে, প্রার্থনাপর্ব শুরু হয়ে গেছে। এরপর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলবে দৌড়, আস্তে আস্তে আকাশে আসবে আলো, সকাল নামবে শিবির জুড়ে। ওদের ছুটে সূর্যেরও আলসেমি যাবে ছুটে, সে দ্রুত টগবগিয়ে আসবে, প্রথম রোদে ঝলমল করবে ওদের পাহাড়শিরের দিকে ছুটে যাওয়া। এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আর কী হতে পারে? আসল কথা পাহাড়। পাহাড় আমাদের স্বপ্নে, চিন্তায়, কাজে, ঘুমে, জাগরণে। আরোহীর ধম্মকম্ম বলতে এইটুকু – আজকের পুত্রকন্যাদের আগামীর জন্য প্রস্তুত করা। আর কিছু নয়। বাকিটা ওরাই বুঝে নেবে।

এ নিয়ে আরোহী তাদের ৩৪নং রক-ক্লাইম্বিং কোর্স, সঙ্গে নেচার স্টাডি ক্যাম্প, সেরে উঠতে পারল একঝাঁক নতুন পুরনো ছেলেমেয়েদের সঙ্গী করে। শিক্ষক শিক্ষার্থী কর্মকর্তা মিলে তা প্রায় দেড়শো জনের দল। ১৯-২২ জানুয়ারি, পুরুলিয়ার গজাবুরু পাহাড় জুড়ে সে এক হৈ হৈ কাণ্ড। পাহাড়ে কে কতটা জবরদস্ত হয়ে উঠতে পারল জানি না, সেতো যারা চারটে দিন তনু-মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করেছে গজাবুরুর পাহাড় ও তেপান্তর তারা বলবে। তাদের একজন এবারের সংখ্যায় লিখেছে এই শিবিরের অভিজ্ঞতা নিয়ে। এই লেখাটিকে প্রতিনিধিত্বমূলক ধরে নিলে বলতেই হয়, সামনের দিন-গুলো বেশ উজ্জ্বল।

আজ এই পর্যন্ত। ভালো থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন।